দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৩৫ ও ৩৬ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৮, ২০১৯

মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাভাবনা: একটি পর্যালোচনা

আহম্মদ উল্লাহ*

বর্তমান পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থায় মহান চিন্তাবিদদের শিক্ষা সম্পর্কিত ভাবনার আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কেননা এটি লক্ষ করা যায় যে, একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যতটা মহান শিক্ষাচিন্তাবিদদের চিন্তা ও দর্শন দ্বারা নির্ধারিত হয় তার চেয়ে বেশি নির্ধারিত হয় বাজারব্যবস্থার চাহিদা পূরণের লক্ষ্য দ্বারা। অন্যভাবে বলা যায় যে, একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পশ্চাতে বাজারব্যবস্থা বা অর্থনীতির প্রভাব প্রকট থাকে। এ কথা বলার উদ্দেশ্য কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থা শাণিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষাচিন্তাবিদদের ভূমিকাকে অস্বীকার করা নয়। বরং যেকোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সার্থক বিকাশে শিক্ষাচিন্তাবিদদের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকা প্রয়োজন তা স্পষ্ট করে তুলে ধরা। জগৎখ্যাত দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষাদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে রুশো, ডিউই, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) শিক্ষাদর্শনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা। গান্ধীজি ব্রিটিশ ভারতের গুজরাটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একইসাথে রাজনীতিবিদ, সমাজতান্ত্রিক, দার্শনিক এবং একজন শিক্ষাবিদ। তিনি কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগের সঞ্চার নিয়ে বাস করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষা জীবনযাপনের একটি উপায়, চরিত্র গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।[১] তিনি বলেন শিক্ষা মানুষের চিন্তার গতিপথ নির্ধারণে, জীবনের লক্ষ্য এবং আদর্শ অর্জনে সক্ষম করে। তিনি অনস্বীকার্যভাবে ভারতে আধুনিক শিক্ষার অন্যতম মহান একজন প্রবক্তা এবং তাঁর শিক্ষাদর্শনে মানুষের নৈতিক, ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে গান্ধীজির চিন্তাধারা হলো শিক্ষা সবার জীবনযাপনের মূল উপায়।[২] গান্ধীজির শিক্ষা দর্শনের প্রভাব বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। এটি একইসাথে অভিজ্ঞতামূলক এবং বিশ্লেষণমূলক যা গান্ধীর জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি, বুনিয়াদি শিক্ষার অর্থ, বুনিয়াদি

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং এর পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে। গান্ধীজি বুনিয়াদি শিক্ষার মাধ্যমে একটি নিরব সামাজিক বিপ্লব চেয়েছিলেন যা নিছক প্রযুক্তির পক্ষে দাঁড়ায় না। বরং এটি হস্তশিল্পকেন্দ্রিক একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যা আধ্যাত্মিক এবং আত্মোপলব্ধির দ্বারা পরিপূর্ণ এবং তা সবসময় সত্যের অনুসন্ধান করে। পরিশেষে প্রবন্ধটিতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা সবিচার ব্যাখ্যা করা হবে।

(১)

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, যাকে আধুনিক যুগের বুদ্ধ, যীশু মনে করা হয়। ভারতীয়গণ তাঁকে 'জাতির পিতা' হিসেবে অভিহিত করেন এবং তারা তাঁর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করেন। সমস্ত বিশ্ব এমনকি তাঁর বিরোধীগণও তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। গান্ধীজি সেসময়ের শিক্ষাব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন এবং তিনি এমতাবস্থায় ভূমিকা রাখতে এগিয়ে এসেছিলেন। গান্ধীজির শিক্ষাদর্শন এক অর্থে ছিল তৎকালীন পাশ্চাত্য প্রভাবিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে একরকম প্রতিক্রিয়া। গান্ধীজি বিদেশের জাঁতাকলে পিষ্ট দেশের শিক্ষার বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে বলেন, দেশের বিদ্যমান শিক্ষা ব্যক্তিত্বের বিকাশকে উদ্দীপ্ত করতে পারেনি। প্রচলিত শিক্ষা বাস্তব জীবন ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তথাকথিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান রচনা করেছিল।[৩] তিনি দেখলেন শিক্ষা ছিল নিছক তাত্ত্বিক ও পুঁথিগত বিদ্যার আয়ত্তীকরণ যা কখনওই মানুষকে সমাজ, দেশ ও পৃথিবীর কাজে লাগে এমন সার্থক, কার্যকর ও দক্ষ নাগরিক গড়ে তুলতে পারে না। তিনি ভেবেছিলেন, এসব সীমাবদ্ধতার সঠিক প্রতিকার হতে পারে একটি কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থা ও একটি নীতিনিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে।[৪] গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূর করতে ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধায় গান্ধীজি এক শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন এবং সেখানেই তিনি তাঁর নতুন শিক্ষা পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।[৫] এটি 'বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা' নামে খ্যাত ওয়ার্ধায় গ্রহণ করা হয় বলে এটি 'ওয়ার্ধা পরিকল্পনা' নামেও খ্যাত। শিক্ষার ওয়ার্ধা স্কিম বা বুনিয়াদি তালিম গান্ধীজির চিন্তার ফলাফল। তিনি শিক্ষাকে জাতীয় পুনর্গঠনের কার্যকর উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। তাঁর মতে, বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা তিনটি বিষয়ে ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমত: এই শিক্ষাব্যবস্থা আদি সংস্কৃতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে বিদেশী সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে ছিলো। দ্বিতীয়ত: এটি হাত ও হৃদয়ের সংস্কৃতির অবহেলা করে এবং নিজেকে কেবল মস্তিস্কে সীমাবদ্ধ রাখে। এবং তৃতীয়ত: বিদেশী মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা

সত্যিকার অর্থেই অসম্ভব।[৬] তিনি যেমন তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন তেমনি তিনি তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষা পরিকল্পনার লক্ষ্য বাস্তবায়নের দিকটিকেও সুস্পষ্ট করেছেন। ১৯২১ সালে তাঁর রচনা ‘Young India’-তে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি যে শিক্ষার কথা চিন্তা করেছেন তা তিনটি উদ্দেশ্য সাধন করে। তিনি বলেন, তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষা পরিকল্পনা শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করে, শিশুদের দেহের সাথে সাথে মনকেও প্রশিক্ষিত করে। বিদেশী সূতা এবং কাপড় বর্জনের পথকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করে। তদুপরি, এভাবে গড়ে ওঠা শিশুরা স্বনির্ভর ও স্বাধীন হবে।[৭] বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে গান্ধীজি লিখেছেন, ‘আমার পরিকল্পনা হলো পল্লীর হস্তশিল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা।’[৮] তিনি এটিকে বিবেচনা করেছেন সুদূর প্রসারিত ফলাফলের জন্য একরকম নীরব সামাজিক বিপ্লব হিসেবে। সে লক্ষ্যেই তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির ভিত্তিতে বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

মহাত্মা গান্ধী শিক্ষাবোধের ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। এ লক্ষ্যেই তিনি তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তাব করেছিলেন। এ শিক্ষা পরিকল্পনা ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। এটির উদ্দেশ্য ছিল শিশুকে স্বনির্ভর করার পাশাপাশি ব্যবহারিক জীবনে তার অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগানোর সক্ষমতা তৈরি করা। বুনিয়াদি শিক্ষার সাথে শিক্ষার মৌলিক চাহিদা এবং শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহের দিকটির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেননা এ শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হলো শিশু এবং এ শিক্ষার মূল কথা হলো-কাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণ। অর্থ্যাৎ এই শিক্ষা পরিকল্পনার কেন্দ্রিয় ধারণা ছিল কিছু হস্তশিল্প যা শিশুকে তার জীবিকা নির্বাহের সমস্যা সমাধান করতে এবং একই সাথে সুনাগরিকের গুণাবলি বিকাশ করতে সক্ষম করবে। গান্ধীজির মতে, সুশিক্ষা অবশ্যই নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনধারার সাথে সম্পর্কিত হবে এবং তাই তিনি শিক্ষাকে পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করার কথা বলেছেন।[৯] শিক্ষা সম্পর্কে গান্ধীজির সংজ্ঞা তাঁর শিক্ষা দর্শনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

প্রশ্ন হলো গান্ধীজির মতে শিক্ষা কী? প্রকৃত শিক্ষা বলতে তিনি শিশুর এবং মানুষের দেহ মন ও আত্মার সর্বজনীন বিকাশকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে কেবল স্বাক্ষরতাই শিক্ষার শুরু বা শেষ নয়। এটি কেবল শিক্ষার মাধ্যমগুলোর একটি যার মাধ্যমে নারী এবং পুরুষ শিক্ষিত হবে। তিনি তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় স্বাক্ষরতাকে কমই মূল্য দিয়েছিলেন। তাঁর মতে একজন স্বাক্ষর ব্যক্তি অবশ্যই একজন শিক্ষিত মানুষ নন। শিক্ষা একটি ব্যাপক বিষয়। এটি হলো সার্বিক ও সার্বজনীন বিকাশ বা বহুপাক্ষিক বিকাশ যা দেহ, মন এবং অন্তরাত্মাকে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে।[১০] এমন বিকাশের বাস্তবায়নের জন্য তিনি হস্তশিল্পভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষা চিন্তা করেছিলেন। তিনি

মনে করেন হস্তশিল্প শিশুর মন ও আত্মার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটতে পারে। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে গান্ধীজি উপলব্ধি করেছিলেন যে, কারিগরি শিক্ষা দিতে হবে শিশুদের বৈজ্ঞানিকভাবে। অর্থাৎ শিশু জানবে কেন এবং কি কারণে শিল্পের প্রক্রিয়াগুলোর প্রয়োজন হয়।[১১] এর মাধ্যমে শিশুরা প্রতিটি শিল্প সম্পর্কে এমন ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করবে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্ভাব্য প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিবে। ফলশ্রুতিতে শিশুদের সার্বিক বিকাশ ঘটবে যা পঠন ও লিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে অপ্রতিভ ছিল। যদি শিশুরা যথার্থ শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয় তবে কারিগরি শিল্প শিশুদেরকে শ্রমের মর্যাদা, সকল প্রাথমিক বিষয়, লিখন সক্ষমতা, বৌদ্ধিক বিকাশ, আদি বা পূর্বপুরুষের শিল্পের প্রতি ভালোবাসা এবং দেশপ্রেম শিক্ষা দেবে। তৎকালীন ভারতবর্ষে এমন শিক্ষাব্যবস্থারই প্রয়োজন ছিল। গান্ধীজি একজন প্রায়োগিক শিক্ষাদার্শনিক ছিলেন এবং প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন পরীক্ষক। সত্য এবং শিক্ষা বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতাগুলোই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ উপলব্ধির অন্যতম উপকরণ। গান্ধীজি আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন সত্য এবং অহিংসাভিত্তিক একটি সমাজ বিনির্মাণের। তাঁর এ চাওয়ার বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল কেবল একটি নিরব সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিরব সামাজিক বিপ্লবে সহায়ক হতে পারে। কাজেই তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনা কেবল কৌশলগত ভিত্তি ছিল না বরং এটি ছিল একটি নতুন চেতনা এবং সবার জন্য শিক্ষার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।

অধিকাংশ শিক্ষাবিদের ক্ষেত্রে শিক্ষা পরিকল্পনা হয় তাদের নিজেদের জীবন দর্শনের প্রতিফলন। গান্ধীজির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনা যা ‘বুনিয়াদি শিক্ষা’ হিসেবে পরিচিত, তা মূলত তাঁর জীবনদর্শনেরই প্রতিচ্ছবি। মূলগতভাবে ভাববাদী দার্শনিক মহাত্মা গান্ধী ছিলেন ‘সত্য’ ও ‘অহিংসা’-এর নীতিতে বিশ্বাসী। তিনি বলেন, ‘সত্যে’ পৌঁছানোই জীবনের লক্ষ্য। আর ‘অহিংসা’ হচ্ছে ‘সত্যে’ পৌঁছানোর উপায়। ‘সত্য’ ও ‘অহিংসা’ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তাই আমাদের মহান কর্তব্য হচ্ছে অহিংসার পথে থাকা। সত্যের লক্ষ্যে চললে আরও গভীর সত্য বা পরম সত্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব এবং এই ‘পরমসত্য’ হচ্ছে ‘ঈশ্বর’। গান্ধীজি মনে করেন যদিও আমরা মানুষেরা বিভিন্ন দেহ নিয়ে অবস্থান করি তবু আমরা এক পরমাত্মা থেকেই উদগত হয়েছি, যেমন সূর্যের কিরণ বহুপথে বিচ্ছুরিত হলেও তার উৎস একই। তাই তিনি বলেন, ‘মানব সেবাই ঈশ্বর সেবা’। তাই তাঁর জীবনদর্শন বলে, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগে আত্মোন্নয়ন ও আত্মোপলব্ধি ঘটিয়ে মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলে প্রকৃত সত্যে পৌঁছানো এবং ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা সম্ভব। গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনার পিছনেও তাই আছে এক

দর্শন 'জীবনের দিকে যাত্রা'। এই দর্শন সমাজে বিপ্লব আনতে পারে, সমাজ সংস্কার করে একে নতুনভাবে সৃষ্টি করতে পারে।[১২]

উনিশ শতকের শেষের দিকে উপমহাদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এক রকম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময় ইংরেজ ধারার শিক্ষার গুরুত্ব কমতে থাকে। সেসময়ের ভদ্রলোকখ্যাত গোষ্ঠীর নিকট ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব ততটা পায় না যতটা সেই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ছিল। ভারতীয় ভদ্রলোকগোষ্ঠীর মধ্যে তৎকালীন সময়ে ইংরেজি শিক্ষার মহিমা ও তার জ্ঞানদীপ্ত ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা মোহমুক্তি ঘটে। তবে তারা তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন নি। বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষীয় শিক্ষাব্যবস্থায় তখন মাতৃভাষা এবং জাতীয় সংস্কৃতির বিষয়টি একদিকে যেমন স্বীকৃতি পায় অন্যদিকে এ বিষয়গুলো শিক্ষা বিষয়ক আলোচনায় মর্যাদাপূর্ণ আসন অধিকার করে। এ বিষয়ে দ্বিমত করবার অবকাশ নেই যে, গান্ধীজি ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করার পাশাপাশি তাঁর নিজস্ব শিক্ষাভাবনা প্রদান করেন। জাতীয় বা নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা গঠনের তাড়নাই তাঁকে নিজস্ব শিক্ষা সম্পর্কিত আদর্শ গঠনে চালিত করে। তাঁর লেখনিতে এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে গান্ধীজির *হিন্দু স্বরাজ* (১৯০৮) এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে স্বনির্ভর গ্রাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার একরকম তাড়না পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে তিনি "স্বরাজ" এর সারসত্তা হিসেবে "আত্মশক্তি"কে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ইংরেজি শিক্ষার মন্দ প্রভাব ও মাতৃভাষায় অবমূল্যায়ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[১৩] *স্বরাজ* গান্ধীজির নিকট কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতাই ছিল না। স্বরাজ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন "জনগণের বিচারে স্ব-শাসন।" যেভাবে "দেশপ্রেম বলতে তিনি সকলের কল্যাণ" বুঝিয়েছেন।[১৪] তিনি মনে করেন স্বরাজ কোন শোষণমূলক সমাজে অর্জন করা সম্ভব নয়। স্বরাজ অর্জন করতে হলে জনগণের জন্য শিক্ষার একটি জাতীয় কর্মসূচি প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, 'স্বরাজ'-এর প্রতি যাত্রা কষ্টসাধ্য। এতে ব্যাপক মনোযোগের প্রয়োজন। এটির অর্থ বিস্তারিত সাংগঠনিক সামর্থ্য, গ্রামের সেবায় গ্রামে সর্বাত্মক অনুপ্রবেশ। অন্য অর্থে এটি হলো জাতীয় শিক্ষা, জনগণের শিক্ষা। স্বরাজ হলো জনগণের মধ্যে জাতীয় সচেতনতার জাগিয়ে তোলা।[১৫] গান্ধীজির 'স্বরাজ'-এর ধারণার মধ্যে তাঁর শিক্ষার আদর্শ নিহিত। গান্ধীজি শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়কে চিন্তা করেছেন। তিনি শিক্ষার দু'ধরনের লক্ষ্যের কথা বলেছেন। প্রথমত: শিক্ষার চরম লক্ষ্য, তা হলো ব্যক্তির আধ্যাত্মশক্তির উদ্বোধন ও তার পূর্ণ বিকাশ। দ্বিতীয়ত: শিক্ষার তাৎক্ষণিক লক্ষ্য। তাঁর মতে, শিক্ষার তাৎক্ষণিক লক্ষ্য বহুবিধ। ভারতের National Council of Education Research and Training (NCERT)[১৬] কর্তৃক প্রণীত *Basic Education- A fresh book* গ্রন্থে গান্ধীজির

বুনিয়াদি শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে গান্ধীজির শিক্ষার লক্ষ্য কেবল সুষম ও সমন্বয়ী ব্যক্তি তৈরিই নয়; বরং সামাজিক অগ্রগতি, জাতীয় উন্নয়ন, সকলের জন্য জীবিকার নিশ্চয়তাসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জাতীয় সংহতি, মানবজাতির সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের শিক্ষাকে সম্পর্কিত করে সুষম সমাজ গঠন করা। অর্থ্যাৎ গান্ধীজির শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সত্য, স্বাধীনতা, সাম্য, প্রেম ও অহিংসার উপর ভিত্তি করে একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা।

(২)

গান্ধীজির শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবনদর্শন থেকে উদ্ভূত তিনটি প্রধান দার্শনিক মতবাদের সমন্বিত রূপ। তাঁর শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্য ভাববাদী, গঠন প্রকৃতিবাদী এবং পদ্ধতি বা কার্যক্রম প্রয়োগবাদী। এ তিনটি মতবাদের সমন্বয়ে গান্ধীজির শিক্ষাদর্শন গড়ে উঠেছে।[১৭] গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার এক নতুন সংস্করণ। দক্ষিণ আফ্রিকায় টলস্টয় ফার্মে তিনি নতুন এক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। টলস্টয়-এর *The Kingdom of God is Within You*[১৮] গান্ধীজিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। যা গান্ধীজি নিজেও স্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর *The Story Of My Experience With Truth* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পনেরতম অধ্যায়ে বলেছেন, টলস্টয়ের গ্রন্থটি তাঁকে অভিভূত করেছে এবং তাঁর চিন্তায় একটি স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে।[১৯] টলস্টয়ের শিক্ষাচিন্তার মৌলিক বিষয় হল কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা। হাতের কাজ ও শিল্পকর্মের মাধ্যমে শিক্ষা। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গান্ধীজি এই মূল সত্যটিকে তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় বাস্তবায়ন করতে চান। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-ভাবনার বাস্তব উপযোগিতাকে যাচাই করার জন্য এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে শিশু শিক্ষার জন্য কর্মকেন্দ্রিক ও শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।[২০] গান্ধীজির মতে, এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য নিতান্ত যান্ত্রিক উপায়ে উৎপাদনে সক্ষম নিপুণ কর্মী সৃষ্টি নয়। এর উদ্দেশ্য শিল্পকর্মটির মধ্যে যে অখণ্ড শিক্ষার সম্ভাবনা আছে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার। এর অর্থ শিল্পকর্মের দ্বারা উৎপাদনই শুধু বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় নয়, এই শিল্পকর্ম বিদ্যালয়ের অন্য সমস্ত শিক্ষারও ভিত্তি।[২১] গান্ধীজি তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনাকে বুনিয়াদি শিক্ষা বলেছেন কারণ তিনি মনে করেন এটি ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তিভূমি। এর বুনিয়াদের উপর গড়ে উঠবে পূর্ণ বিকশিত জীবনের ইমারত। এবং ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এটি সেসময়ের জন্য প্রয়োজনীয়।[২২]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গান্ধীজির শিক্ষাভাবনা তাঁর জীবনদর্শন ও জীবন সম্পর্কিত পরীক্ষানিরীক্ষার ফল। তাই ১৯৩৭ সালে প্রথম তিনি তাঁর শিক্ষাভাবনার প্রকাশ করলেও তিনি নিয়ত সচেষ্ট ছিলেন তাঁর ভাবনারই উন্নয়নের

পরীক্ষণে। সে ধারবাহিকতায় তিনি ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে সেবাগ্রামে জাতীয় শিক্ষার্থীদের এক সম্মেলনে তাঁর শিক্ষাভাবনার বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। গান্ধীজি বলেন, প্রচলিত বুনিয়াদি শিক্ষা 'মানুষের জীবনের সর্বস্তরের শিক্ষা' হয়ে ওঠেনি। সেইভাবে গড়ে তোলার জন্য তিনি বুনিয়াদি শিক্ষার ৪টি স্তরের কথা বলেন এবং এই সম্প্রসারিত বুনিয়াদি শিক্ষার নাম দিলেন, 'নঈ তালিম' অথবা 'নয়া শিক্ষা'। 'নঈ তালিম' বুনিয়াদি শিক্ষার সম্প্রসারণ মাত্র। এ শিক্ষার ৪টি স্তর হলো: ১. প্রাক বুনিয়াদি স্তর: ৭ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য ২. বুনিয়াদি স্তর: ৭-১৪ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য ৩. উত্তর বুনিয়াদি স্তর: ১৪-১৮ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য ৪. বয়স্কদের শিক্ষা: তিনি বলেছিলেন বয়স্ক শিক্ষা বুনিয়াদি শিক্ষার একটি নির্ভরযোগ্য অংশ হওয়া উচিত।[২৩] প্রথম পর্যায় হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বা সাত বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য শিক্ষা। যখন শিশুরা স্বাধীন হয়, নিজে পায়ে হেটে বিদ্যালয়ে যেতে পারে তখন শিক্ষার ক্ষেত্র ঘর থেকে বিদ্যালয়ে সম্প্রসারিত হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকৃত অর্থে শিশুর সকল বৃত্তির শিক্ষা যা বাবা-মা সমাজ, ঘর ও গ্রামের সহযোগিতা ছাড়া শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। সাম্প্রতিক বা বর্তমান সময়ে প্লে স্কুল বা প্রি-স্কুল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নেয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশু শারীরিক শিক্ষা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য, সামাজিক প্রশিক্ষণ, সৃষ্টিশীল কাজ (কাজ ও খেলা উভয়ই), প্রকৃতি, শিল্প ও সঙ্গীত ইত্যাদি শেখে। দ্বিতীয় পর্যায় হলো সাত থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত বালক এবং বালিকাদের আট বছরের প্রাথমিক/মৌলিক শিক্ষার কার্যক্রম। তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষা হলো ঐ প্রাথমিক উত্তর শিক্ষা যা গান্ধী সেবাগ্রাম এবং বিহারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। এ কার্যক্রমকে মনে করা হয় পনেরো থেকে আঠারো বছর বয়সী কিশোরদের শিক্ষাগত লালন-পালন হিসাবে। যদিও প্রাথমিক শিক্ষাকে 'স্বনির্ভরতার মাধ্যমে শিক্ষা' পরিকল্পনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আবাসিক হতে হবে। গান্ধীর মতানুযায়ী এটি সম্ভবত একটি স্কুল-গ্রাম রূপ গ্রহণ করা উচিত যেখানে উৎপাদনশীল ক্রিয়াকলাপের এমন বৃহৎ পরিসর সৃষ্টি করবে যা সংগঠিত জ্ঞান লাভ করতে সহায়ক হবে। প্রাথমিক উত্তর শিক্ষা স্বাভাবিকভাবেই কারো জন্য হয়তোবা স্বাভাবিক উৎপাদনশীল পেশার মধ্য দিয়ে পরিণত পরিবারিক জীবনে পরিচালিত করবে অথবা কাউকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশাগত প্রশিক্ষণে পরিচালিত করবে। 'নঈ তালিম' এর চতুর্থ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তর বা পর্যায় নিকট ভবিষ্যতের অনেক সতর্ক চিন্তাভাবনার দাবি করবে যাতে জীবনের জন্য এবং জীবনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার নীতিগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকে স্থায়ী করতে পারে এবং যাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বতন্ত্র এবং

মূল্যবান ঐতিহ্য 'জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান' না হারিয়ে মানবজাতির প্রকৃত প্রয়োজনকে পূরণ করতে পারবে।

গান্ধীজি 'নঈ তালিম' কর্মসূচির মাধ্যমে এক বৈপ্লবিক প্রস্তাব প্রদান করেন। তিনি তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তাবনার মাধ্যমে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করেন। তাঁর এই নতুন শিক্ষা পরিকল্পনা জীবনের জন্য শিক্ষা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণত স্বীকৃত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা প্রক্রিয়া শুরু হয় অল্প বয়স থেকে এবং অধিকাংশ শিশুদের ক্ষেত্রে তা প্রাথমিক পর্যায়ে শেষ হয়ে যায়। সৌভাগ্যবান কিছু শিশুর ক্ষেত্রে তা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে। 'নঈ তালিম'-এ শিক্ষা প্রক্রিয়া বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয়। এটি স্পষ্ট যে, যদি এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা যদি কার্যকর হতে হয় তবে তার ভিত্তি হতে হবে গভীর বা দৃঢ়। এটি কেবল শিশুদের সাথে নয়, বরং, অভিভাবক এবং সম্প্রদায়ের সাথে বা সমাজের সাথে হতে হবে অবশ্যই।

(৩)

গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা। গান্ধীজি সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সকল ছেলে-মেয়ের জন্য বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষা চেয়েছিলেন। তিনি এমন শিক্ষা পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছিলেন যা একদিকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং ব্যবহারিক দিক থেকে গণমানুষের শিক্ষাসমস্যার সমাধান করবে। এ পরিকল্পনার মৌলিক ধারণা ছিল কর্মমুখী প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান, হস্তশিল্পের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান। গান্ধীজির মতে, শুরু থেকেই গ্রামভিত্তিক হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করার পদ্ধতি অনুসরণ করলে শিশুর মনের প্রকৃত ও শৃঙ্খলিত বিকাশ সম্ভব।[২৪] হস্তশিল্পকে শিক্ষার কেন্দ্রিয় বিষয় হিসেবে দেখার সুবিধার এমন বিষয় পরবর্তীতে জাকির হুসাইন কমিটির সুপারিশে লক্ষ করা যায়। কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়: "মনোস্তাত্ত্বিকভাবে এটি কাঙ্ক্ষিত। কারণ এটি শিশুকে একটি ছদ্মবেশী একাডেমিক এবং তাত্ত্বিক নির্দেশের অত্যাচার থেকে মুক্তি দেয়, যার বিরুদ্ধে তার সক্রিয় প্রকৃতি সর্বদা স্বাস্থ্যকর প্রতিবাদ করে চলেছে।"[২৫]

গান্ধীজি কেতাবি মুখস্থ শিক্ষার সমালোচনা করেছেন। স্কুলে অধিক বই নির্দেশ না করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন আমাদের মতো দরিদ্র দেশসমূহে বিদ্যালয়গুলোতে বই নির্দেশ করতে হবে বিচক্ষণতার সাথে এবং তা অবশ্যই সংখ্যায় স্বল্প হবে নতুবা দরিদ্র শিশুরা শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত হবে।[২৬] তিনি শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায়

পর্যন্ত মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার আবশ্যিকতার কথা বলেছেন। তিনি ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষার বিষয়কে অনুমোদন করেননি। এমনকি এর পরেও ইংরেজি সবার শেখা উচিত নয় বলে তিনি মনে করতেন।[২৭] এক্ষেত্রে গান্ধীজি কঠোর মানসিকতা পোষণ করতেন। তিনি বলেন, যে সমস্ত কুসংস্কার ভারতীয় সমাজকে প্রভাবিত করেছিল তার মধ্যে তা ততটা গুরুতর ছিল না, চিন্তার স্বাধীনতা ও চিন্তার যথার্থতা বিকাশে ইংরেজি ভাষার জ্ঞানের আবশ্যিকতা যতটা ছিল।[২৮] তাঁর মতে, যদি আমরা জাতিগতভাবে আত্মহত্যা না করতে চাই, তবে আমাদের চিন্তার মাধ্যম ইংরেজি অবশ্যই হতে পারে না।[২৯] গান্ধীজি মনে করেন রামমোহন রায় আরও বড় সংস্কারক হতে পারতেন এবং লোকমান্য তিলক আরও মহান পণ্ডিত হতে পারতেন যদিনা তাঁরা তাদের চিন্তাকে ইংরেজিতে আবদ্ধ করতেন ... । এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তাঁরা তাদের জ্ঞান দ্বারা ইংরেজি সাহিত্যের সমৃদ্ধ ধন অর্জন করেছেন। কিন্তু এগুলো তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে অবিগম্য হওয়া উচিত ছিল। কোন দেশই অনুবাদকের একটি সম্প্রদায় তৈরি করে জাতিতে পরিণত হতে পারে না।[৩০] গান্ধীজি তাঁর শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার কথা বলেছিলেন।

গান্ধীজির শিক্ষাভাবনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিলো উৎপাদনশীল কর্মের ধারণা। গান্ধীজি কাজের মধ্যে খেলার চেতনা পেয়েছিলেন। প্রকৃতি, সৃজনশীল কাজ যেমন: সংগীত ও অঙ্কনের প্রতিও গান্ধীজি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সৌন্দর্য অনুসন্ধান করতেন হস্তচালিত নৈপুণ্য আর উৎপাদনশীল কর্মের মধ্যে। তাঁর চিন্তার প্রক্রিয়াতে সবসময় অন্তর্নিবিষ্ট ছিল সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক সমস্যাবলি। বলা যায় গান্ধীজি তাঁর জীবনদর্শনের ভিত্তিতে তাঁর স্বভাবের সাথে মিল রেখে কাজের সংস্কৃতিকে সমর্থন করেছেন এবং তিনি প্রেম ও স্বাধীনতার সাথে সর্বোচ্চ মূল্য সংযুক্ত করেছেন। তিনি পশ্চিমা ভোগবাদকে ত্যাগ করেছেন। কঠোর সংযম এবং কায়িকশ্রম গান্ধীজির মানবিক মূল্যবোধের মৌলিক উপাদানগুলো গঠন করেছিল। তাই এটা সত্য বলা যেতে পারে যে, গান্ধীজি বেছে নিয়েছিলেন 'কর্মের পথ'।

গান্ধীজি মুনাফা ফলনশীল গঠনমূলক কর্মের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা চেয়েছিলেন এবং তার মূল কথা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণতা। গান্ধীজির মতে, হস্তচালিত প্রশিক্ষণ অর্থ এই নয় যে, এটি বিদ্যালয়ের যাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য কোন কিছুর উৎপাদন করা কিংবা এমন খেলনা তৈরি করা বোঝায় না যার কোন মূল্য নেই। এটি বাজারজাতকরণযোগ্য কোন কিছু উৎপাদন করাকে বোঝায়। শিশুরা চাবুকের ভয়ে কোন কারখানার জন্য আগের দিনে যেভাবে উৎপাদন কাজ করতো সেজন্য বা সেভাবে তারা করবে না। বরং তারা এজন্য করবে যে, এ কাজ তাদের আনন্দ দেয় এবং তাদের বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করে।[৩১]

গান্ধীজির নিকট বুনিয়াদি শিক্ষা তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণের বিকল্প হিসেবে কায়িকশ্রমের নৈতিকতার ভিত্তিতে গান্ধীজি রাজনৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। শ্রমজীবী মানুষের মনোজগতের উপর গান্ধীজি ছিলেন নিবিড় সংবেদনশীল । তিনি কৃষিভিত্তিক সমাজে শ্রমজীবী মানুষের প্রয়োজনানুসারে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু শ্রমজীবী মানুষের নিকট কায়িকশ্রম তাদের অন্যতম মূলধন সেহেতু কায়িকশ্রমের প্রতি গান্ধীজির গুরুত্ব প্রদান যুক্তিযুক্ত ছিল। গান্ধীজি মনে করতেন যান্ত্রিক সভ্যতা অনৈতিক এবং তা পরিণামে ধ্বংস নিয়ে আসবে।

গান্ধীজির শিক্ষা পরিকল্পনার আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো নাগরিকত্বের আদর্শ। এটির উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতের নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, মর্যাদা, দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সহযোগিতামূলক সমাজ গঠন ও সামাজিক সেবায় উদ্বুদ্ধ করবে। জাকির হুসাইন কমিটিও এমনটা বিবেচনা করেছেন। তাদের মতে, নতুন প্রজন্মের তাদের সমস্যা, অধিকার ও দায়বদ্ধতা উপলব্ধির সুযোগ থাকা উচিত।

গান্ধীজির শিক্ষাদর্শনে বয়স্কশিক্ষা ও নারীশিক্ষা-এর ধারণা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর মতে, বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্য হল এ শিক্ষা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, স্বাস্থ্য বিষয়ক, সামাজিক ইত্যাদি সকল দিক দিয়েই সকল গ্রামবাসীর জীবনকে স্পর্শ করবে। বুনিয়াদি শিক্ষার মাধ্যমে তিনি গ্রামকেন্দ্রিক ভারতীয় সমাজ জীবনে এক অহিংস ও শান্তিপূর্ণ সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল নির্বাচিত শিক্ষক ও পাঠক্রমের সাহায্যে অগণিত জনসাধারণকে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।[৩২] নারীশিক্ষার কথা বলতে গিয়ে গান্ধীজি নারীদের বিভিন্ন সংস্কার ও আচারের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে বলেছেন এবং তাদের প্রবণতা ও জীবনের চাহিদানুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের তুলনায় শিক্ষিকাগণই বেশি উপযোগী। দার্শনিক প্লেটোর মতো গান্ধীজির নারী জাতির বুদ্ধি ও যোগ্যতার ওপর ভীষণ আস্থা ছিল।[৩৩]

গান্ধীজি তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনা উপস্থাপনের পাশাপাশি তার সঠিক বাস্তবায়নের বিষয়েও সতর্ক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যথাযথ শিক্ষা একজন যোগ্য ও আদর্শবান শিক্ষকের দ্বারাই সফল হতে পারে। কেননা যে কোন সামাজিক উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গান্ধীজি বলেছেন, তাঁর বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনাকে সার্থক ও কার্যকরভাবে রূপায়িত করতে হলে শিক্ষককে ভালোভাবে প্রস্তুত হতে হবে

এবং ভাববাদের দ্বারা লালিত হতে হবে। তাঁদের কেবল কারিগরি হলেই চলবে না, হতে হবে সৌন্দর্যবোধযুক্ত শিল্পী। তাঁর মতানুযায়ী আদর্শ শিক্ষকের অন্তরে থাকবে ভালোবাসা, পরম সেবার মনোভাব, সহানুভূতি, অফুরন্ত উৎসাহ, ত্যাগের ইচ্ছা, দেশভক্তি এবং সঙ্গে থাকবে অফুরন্ত জ্ঞান। শিক্ষকের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতনতা থাকবে এবং তিনি সামাজিক মনোভাবের অধিকারী হবেন। সবার ওপর নিজের বৃত্তি বা পেশার প্রতি থাকবে অকৃত্রিম ভালোবাসা। তিনি বলেন, শিক্ষকের জীবন্ত স্নেহ স্পর্শেই কেবল হৃদয়ের শিক্ষা দেওয়া যায়। শিক্ষকের আদর্শ চরিত্র বিদ্যার্থীর মধ্যে ভক্তি ও ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতার বোধ জাগিয়ে তুলবে।[৩৪] পাশাপাশি তিনি তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম পরিচালনায় শিক্ষকের স্বশাসনের কথাও বলেছেন। তাঁর এই ধারণার সাথে টলস্টয়ের উদারবাদী নীতির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তিনি বলেন, শিক্ষকের প্রেরণা ও নিপুণতা শিক্ষার্থীকে শিল্পকর্মে উৎসাহিত করবে, উদ্যোগী করবে। শিক্ষক এমন শিল্পকর্ম নির্বাচন করবেন যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী অনেক বিষয় সহগতির মাধ্যমে শিখে নিতে পারবে।[৩৫]

(৪)

গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা তৎকালীন ভারতে নতুন ও অভিনব হলেও পরবর্তীতে অনেকেই তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনার নানা বিষয়ের সমালোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও তৎকালীন এবং তদপরবর্তী শিক্ষা কমিশনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যকার এ বিষয়ক ব্যবধান আরো বিস্তৃত হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ বিরোধিতা এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অসহযোগ আন্দোলনের গান্ধীজির এমন মনোভাবকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেননি। রবীন্দ্রনাথ বস্তুত জগদানন্দ রায়ের নিকট লিখিত একটি চিঠিতে জাতীয়তাবাদকে "ভৌগোলিক প্রেতাত্মা" বলে সমালোচনা করেছেন। তিনি লেখেন "... সমগ্র পৃথিবী আজ এ প্রেতাত্মার ভয়ে শঙ্কিত। সময় এসেছে তার থেকে মুক্ত হবার।"[৩৬] রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত রচনা *'শিক্ষার মিলন'* রচনা করেন। এ রচনায় তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি জোড় দিয়েছেন যা *'বিশ্ব-ভারতী'* এর কেন্দ্রীয় ধারণা।[৩৭] রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য থেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে চেয়েছিলেন পাশাপাশি প্রাচ্যের প্রজ্ঞা ও ত্যাগী মানসিকতার দ্বারা পাশ্চাত্যকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন বিশেষত ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতাকে পশ্চাদপদ পদক্ষেপ হিসেবে সমালোচনা করেন এবং বলেন এমন পদক্ষেপ জাতীয় জীবনে মুক্ত বাতাস প্রবেশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টির মাধ্যমে জীবন একটি আবদ্ধ

কারাগারে রূপান্তরিত করবে।[৩৮] রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং তৎকালীন ভদ্রলোকগোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিনিধি তিনিও গান্ধীজির ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনীহার সমালোচনা করে বলেছিলেন, ইংরেজি পরিত্যাগ করা হবে একরকম বৌদ্ধিক আত্মহত্যা।[৩৯]

এছাড়াও ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হাউজে অনুষ্ঠিত New Education Fellowship সভায় এক লিখিত বার্তায় রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজির আত্মনির্ভর বিদ্যালয়ের ধারণাকে সমালোচনা করেন এবং এটিকে অগ্রহণযোগ্য বলে পরিত্যাগ করেন। তিনি বলেন, এমন ব্যবস্থা মৌলিক শিক্ষার ধারণাকে ব্যক্তিগত উন্নয়নের পরিবর্তে বস্তুগত প্রয়োজনীয়তার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। তিনি খেলাধুলার পরিবর্তে উৎপাদনমূলক কার্যাবলি এবং শিক্ষার্থীদের শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত লভ্যাংশের অংশীদার হিসেবে শিক্ষকদের সুযোগ গ্রহণকে সমর্থন করেননি।[৪০] পরবর্তীতে জাকির হোসাইন গান্ধীজির উৎপাদনমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষা এবং তাতে শিক্ষার্থীদের শ্রমে অর্জিত মুনাফায় শিক্ষকের অংশীদারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এমন ব্যবস্থায় শিক্ষকগণ কঠোর শাসকে পরিণত হতে পারেন এবং শিক্ষার্থীর শ্রমের শোষক বনে যেতে পারেন।[৪১] K T Shah[৪২]-ও গান্ধীজির এমন বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে হীনতা এবং পশ্চাদমুখী ব্যবস্থা হিসেবে সমালোচনা করেন। তারা আরো সমালোচনা করে বলেন, হস্তশিল্পের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া ভালো তবে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, আমরা যন্ত্রযুগে বাস করছি। যদি হস্তশিল্পের প্রতি আমরা অতিমাত্রার জোড় দেই এবং যন্ত্রবিমুখ হই তবে তা আমাদের অর্থনীতির জন্যই ক্ষতিকর।[৪৩] তবে গান্ধীজি তাঁর ভাবনার বিরোধিতার বিষয়টি কল্পনা করেছিলেন। তিনি তাঁর মতের পক্ষে বলেছেন, 'যদি তুমি মনে কর যন্ত্র সত্যিকারেই অবিচ্ছেদ্য তাহলে তুমি আমার ধারণা অবশ্যই বাতিল করবে এবং নতুন কোন কিছু চিন্তা করবে।'[৪৪]

গান্ধীজি ইংরেজি শিক্ষার পুরোপুরি বিরোধী ছিলেন একথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়। যার প্রমাণ হিসেবে লক্ষণীয় যে, তিনি পরবর্তীতে ইংরেজিকে ভাষা হিসেবে শিক্ষার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভালো দিকগুলিকে অস্বীকার করেননি। গান্ধীজি ইংরেজি শিক্ষা বিষয়ে সমালোচনার প্রত্যুত্তরে বলেন, "আমি চাইনা যে আমার গৃহের চারিদিক প্রাচীর দ্বারা ঘেরা হোক আর আমার জানালা বন্ধ হোক। আমি চাই আমার আঙ্গিনার চারপাশে সমগ্র ভূমির সংস্কৃতি যতটা সম্ভব ততটা স্বাধীনভাবে বয়ে যাক। তবে তাদের কারো দ্বারাই আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়াকে আমি চাইনা।"[৪৫] তিনি এটি স্পষ্ট করেছিলেন যে, তিনি ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী নন কিন্তু ইংরেজি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবে তিনি কেবল তার বিরোধিতা

করেন। তিনি এমনটাও চাইতেন না যে, ইংরেজি আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হবে বা ইংরেজি শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক হবে।[৪৬] তিনি বলেন, আমি চাইব আমাদের তরুণ ছেলেমেয়েরা সাহিত্যের রুচি তৈরিতে ইংরেজি এবং অন্য ভাষা যতটা পছন্দ করে শিখুক এবং আশা করব তাদের শিখন মাধ্যম ভারত ও বিশ্বের যতটা পারে উপকার করুক’।[৪৭] গান্ধীজির শিক্ষা পরিকল্পনার সপক্ষে পরবর্তীতে বিখ্যাত সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জোড়ালো বক্তব্য লক্ষ করা যায়। সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ‘শিক্ষার মিলন’ রচনার প্রতিক্রিয়ায় “শিক্ষার বিরোধ” নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর রচনার মূল যুক্তি ছিল রবীন্দ্রনাথ পারস্পরিক সম্পর্কের (পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে) যে মিলন কামনা করেছিলেন তা নিরুপণ করা যায় না, বা বোধগম্য নয়। তাঁর মতে, পাশ্চাত্য বা পশ্চিমাগণ কখনও তাদের সাম্প্রতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান আমাদেরকে প্রদান করবে না। বা প্রাচ্যের ত্যাগী মানসিকতা ও প্রজ্ঞা তারা গ্রহণ করবে না। বরং তারা আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে তাদের প্রতি আমাদের নির্ভরশীলতা কামনা করবে যাতে করে তারা আমাদেরকে শোষণ করতে পারে।[৪৮] তিনি ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিপক্ষে গান্ধীর অহসযোগ আহবানের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন: কখনও কখনও বিদ্যালয়ে যাওয়ার চাইতে তা পরিত্যাগ করা আরো অধিক শিক্ষণীয় ।[৪৯] শিক্ষা সম্পর্কে এমন ভাবনা আমাদের Ivan Illich এর Deschooling Society[৫০] এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী এক দশক বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছিল কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে সে অগ্রগতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। গান্ধীজির শিক্ষা পরিকল্পনার স্বনির্ভরতার দিক পণ্ডিত শিক্ষক, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, এমনকি শিক্ষার প্রশাসনিক কর্তৃত্ব কর্তৃক সমালোচিত হয়েছে। তাঁদের মতে, গান্ধীজির এমন নীতি বিদ্যালয়কে একটি ছোট পরিসরের শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। আর তাছাড়া শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের আয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। এটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্পর্কের মধ্যে একরকম মন্দ প্রভাব ফেলে। হস্তশিল্পের প্রতি অধিক গুরুত্ব একদিকে স্বাধীন শিক্ষাকে অবহেলা করে। অনেক ক্ষেত্রে হস্তশিল্প শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং সামাজিক গুরুত্বের নিরীখে নির্বাচন করা সম্ভব হয় না এবং হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা তখন কেবল স্লোগানে সীমাবদ্ধ থাকে।

গান্ধীজির পরিকল্পনার আরও একটি সীমাবদ্ধতা হল কেবল একটি শিল্প কখনওই সমগ্র শিক্ষার প্রক্রিয়ার ভিত্তি হতে পারেনা। এটি নিরপেক্ষ স্বাধীন শিক্ষার বিকাশে সহায়ক নাও হতে পারে এবং পরিণতিতে কারিগরি ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা তৈরি করতে পারে। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং দক্ষ প্রশাসনিক নীতির

অভাব গান্ধীজির শিক্ষানীতির ব্যর্থতার আরেকটি কারণ। বস্তুত বুনিয়াদি শিক্ষার কর্তৃত্বের মধ্যে (অফিসিয়াল ও নন অফিসিয়াল) কোন যথার্থ সমন্বয় ছিল না। একদিকে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব ছিল, বা এমন কোন সুযোগ ছিল না। অন্যদিকে অধিকাংশ শিক্ষকদের এই ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ছিল না। তাত্ত্বিক দিক থেকে এ নীতি স্বতন্ত্র এবং প্রশ্নাতীত। কিন্তু এর প্রয়োগ সন্তোষজনক ছিল না।

গান্ধীজির স্বপ্ন ছিল তাঁর শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে এক ধরনের নীরব সামাজিক বিপ্লব ঘটানো। তাঁর মতে, তাঁর শিক্ষাভাবনার উদ্দেশ্য ছিল ‘গ্রামের শিশুদের আধুনিক পল্লিবাসী হিসেবে রূপান্তর করা।’[৫১] গান্ধীজির শিক্ষা দর্শন ছিল অহিংস আদর্শ সমুন্নত করার মাধ্যমে এবং তা চরিত্রগতভাবে ছিল অশোষণমূলক। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গান্ধীজির শিক্ষার লক্ষ্য কেবল ব্যক্তিকে কর্মসংস্থানের জন্য প্রস্তুত করা নয় বরং ব্যক্তিকে স্বনির্ভর করে তোলা। গান্ধীজির নিকট শিক্ষার লক্ষ্য ছিল চরিত্র গঠন করা। তিনি এমন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবক্তা ছিলেন যা স্বশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে। অর্থ্যাৎ ব্যক্তির ভবিষ্যৎ এবং জাতীয় অগ্রগতি সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। গান্ধীজি জাতির মুখোমুখি হওয়া বহুবিধ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জের প্রতি কখনও দৃষ্টি হারাননি। তাঁর দর্শন এমন একটি অর্থবহ, কার্যকর এবং প্রাসঙ্গিক শিক্ষার কল্পনা করেছিল যা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের চাহিদা পূরণ করবে।[৫২] কিন্তু গ্রামভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বেশিরভাগক্ষেত্রেই অবাস্তব থেকে যায়। কারণ স্বাধীন ভারত ম্যাকাওলান প্যারাডাইম[৫৩] মনোনীত করেছিল।[৫৪]

(৫)

গান্ধীজির শিক্ষাভাবনার কেবল সীমাবদ্ধতাই নয় বরং তৎকালীন সময়ে অনেকেই তাঁর শিক্ষাদর্শনের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করেছিলেন। তার অন্যতম দৃষ্টান্ত ১৯৪৫ সালের জানুয়ারিতে সেবাগ্রামে অনুষ্ঠিত বুনিয়াদি শিক্ষার উপর সর্বভারতীয় তৃতীয় সম্মেলন। সেখানে সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবায়নের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশে গান্ধীজির ভাবনা যে প্রভাবশালী তা স্বীকার করা হয়েছিল। মানুষ এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল।[৫৫] ১৯৪৫ সালে New Adult Education Committee এর উদ্দেশে গান্ধীজি বলেছিলেন, “জীবনের জন্য শিক্ষার অর্থ জীবনের সময়কালের জন্য শিক্ষা নয়, কিন্তু জীবনের স্বার্থে শিক্ষা ... বয়স্ক শিক্ষা বেঁচে থাকার কৌশল শেখানোর শিক্ষা। যে মানুষ বেঁচে থাকার কৌশল, দক্ষতা অর্জন করেছে সে পরিপূর্ণ মানুষ হয়েছে। এই লক্ষ্য আপনার সামনে রাখুন, নঈ তালিম-এর আদর্শ আপনার কাজের অনুপ্রেরণা জাগাতে দিন।”[৫৬] ১৯৪৯ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টে গান্ধীজির শিক্ষা

সম্পর্কিত এই প্রকল্পটি মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়েছিল।[৫৭] মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গান্ধীজির মতের এ বিষয়টিও পরবর্তীতে জাকির হসাইন কমিটির সুপারিশেও গুরুত্বের সাথে স্বীকৃত হয়েছে। সুপারিশে উল্লেখ করা হয়: "মাতৃভাষার যথাযথ শিক্ষণ সকল শিক্ষার ভিত্তি।"[৫৮] ভারতের শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬),[৫৯] যা কোঠারী কমিশন[৫১] নামে পরিচিত, বুনিয়াদি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল এবং এর কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থায় সংযোজনের সুপারিশ করেছিল। উক্ত কমিশন কর্তৃক কাজের অভিজ্ঞতা, সামাজিক জীবন, সমাজ সেবা, অভিজ্ঞতার সাথে কেতাবি জ্ঞানের সমন্বয় শিক্ষা বৃত্তিমূলককরণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিকাশের জন্য শিক্ষা ইত্যাদি তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা সংযোজনের সুপারিশ করা হয়েছিল।

১৯৭৭ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে সংশোধন করে ঈশ্বরভাই প্যাটেল কমিটি একটি নতুন পরিভাষা প্রদান করে 'সামাজিকভাবে কার্যকর উৎপাদনশীল কর্ম' [SUPW][৬০] পাঠ্যক্রম সুপারিশ করে। কমিটি মতামত প্রদান করে যে শিক্ষা সমাজকেন্দ্রিক হওয়া উচিত। এবং সামাজিকভাবে কার্যকর এবং উৎপাদনশীল কর্ম বিদ্যালয় শিক্ষার প্রতিটি স্তরের পাঠ্যক্রমে কেন্দ্রিয় স্থান দেওয়া উচিত ও সকল একাডেমিক বিষয় তার সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত। লক্ষণীয় যে, এ সকল যুগান্তকারী ধারণা গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষাদর্শন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

(৬)

শিক্ষা সম্পর্কিত অধিকতর প্রভাবশালী জনপ্রিয় চিন্তার প্রেক্ষাপটে গান্ধীজির শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কিত আলোচনা একটু দুরূহ বটে। অন্যদিকে গান্ধীজি নৈতিক রাজনীতির এক বীরপুরুষ ও রক্ষক, যার মনের আকার গঠিত হয়েছে সাধারণের আকাঙ্ক্ষা ও ভাষার দ্বারা। ফলে তাঁর শিক্ষাচিন্তার মধ্যে কোন দ্ব্যর্থতা ছিল না। তাঁর নিকট শিক্ষা হলো তাঁর নৈতিকতাভিত্তিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দ্বিধাহীনভাবে এটি বলা যায় যে, তিনি যেভাবে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করে শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করেছেন ভারতীয় উপমহাদেশে তাঁর মতো করে আর কেউ এমনটা করেননি।

স্বাধীনতা পরবতী সময় থেকেই আমাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একরকম নির্ভরশীলতার উপসর্গ বিদ্যমান ছিল। এটি আশ্চর্যের বিষয় যে, স্বাধীনতার এত বছর পরও আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগতভাবে তেমন অগ্রগতি লাভ করতে পারি নাই। বিশ্বায়নের নামে ইউরোপ আমেরিকার মতো দেশের কাছে এমনকি এশিয়ার দেশ চীনের কাছেও অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে এক ধরনের ঔপনিবেশিক অবস্থায়

রয়েছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া আমাদের সংস্কৃতিকে একরকম ধ্বংস করছে এবং তথাকথিত উন্নত দেশের পুঁজিবাদী সংস্কৃতি, অসভ্য সংস্কৃতিতে অভ্যস্থ হতে বাধ্য করছে। এ প্রেক্ষাপটে মহাত্মা গান্ধী এমন একজন মহাপুরুষ যিনি এতবছর পূর্বেই আধুনিকতার ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা উন্নয়নবাদের যৌক্তিক বাণিজ্যিক পরিণতি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বৈপ্লবিক ধারাবাহিকতার ত্রুটিগুলো সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি এ ব্যবস্থার অযথার্থতা ও স্বৈরতান্ত্রিকতা আঁচ করতে পেরেছিলেন। বলা যায়, তিনিই ছিলেন একমাত্র নেতা যিনি উক্ত দেশগুলোর আধুনিক প্রক্রিয়ার অন্ধ অনুকরণ না করে বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন। তাঁর গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি এবং কর্মমুখী শিক্ষা ভবিষ্যৎ মানবতার জন্য এক ধরনের বিকল্প। শিক্ষা গান্ধীজির সামগ্রিক রাজনৈতিক কর্মসূচির সত্যিকার অর্থেই একটি উপাদান ছিল। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন রাজনীতি এমন এক প্রক্রিয়া যার লক্ষ্য মানবিক মূল্যবোধের স্বাধীনতা।

গান্ধীজির আত্মনির্ভর শিক্ষাভাবনার পক্ষে বলা যেতে পারে, গান্ধীজি এবং ভারতীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে সম্ভবত গান্ধীজি একাই শ্রমজীবী মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাকে দেখেছিলেন এবং এখানেই গান্ধীজির সাথে অন্যদের পার্থক্য নিহিত। গান্ধীজি সঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রমজীবী পরিবারের সন্তানেরা কাজ করে স্বেচ্ছায়, তাদের পরিবারের জন্য। তারা উভয় উদ্দেশ্যই সাধন করার জন্য কাজ করে। তারা জানে তাদের জন্য কাজ নেই তো খাদ্য নেই।[৬১] প্রকৃত প্রস্তাবে ফলপ্রদ উৎপাদনমূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষা গান্ধীজির শিক্ষা সম্পর্কিত এ ধারণা যদি সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা যেত তবে ভূস্বামী সমাজে শিশুশ্রম বিলোপ পেত। এটি হয়তো উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৃষি সম্পর্কীয় কর্মীদের অবস্থান আরো উন্নত করতে পারতো। এটি তাদের জন্য একরকম অর্থনৈতিক ভিত্তিও রচনা করতে পারতো তাদের মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে। গান্ধীজি অবশ্য তাঁর শিক্ষাধারণার এ দিকটির ব্যাখ্যা দেননি বা করেননি। তিনি এটি করেননি সম্ভবত তাঁর অহিংসার আদর্শের কারণে যা দৃশ্যত শ্রেণী সংঘাতকে তীব্রতর করতে দেয় না। কিন্তু তিনি উল্লেখ করেন যে, 'এভাবে গড়ে ওঠা শিশুরা স্বাবলম্বী ও স্বাধীন হয় বা স্বতন্ত্র হয়। এটি গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।'[৬২]

তা সত্ত্বেও যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি গান্ধীজির বিরোধিতা বোধগম্য হলেও তা বাস্তবসম্মত নয়। গান্ধীজির বিভিন্ন রচনা থেকে এটির প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি নিজেও এবিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং পরবর্তীতে সীমিত পরিসরে যন্ত্রের ব্যবহারকে তিনি সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন, যদি যন্ত্রের ব্যবহারে কায়িকশ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং যন্ত্র যদি মানুষের স্থান দখল না করে তবে সীমিত পরিসরে যন্ত্র বিশেষত

সেলাই মেশিন ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি মানুষের শ্রম ও প্রাকৃতিক শক্তির উপর যান্ত্রিক কর্তৃত্বের বিরোধী ছিলেন।

যদিও অধিকাংশই গান্ধীজির মতকে সমর্থন করবে না। কিন্তু শিল্পভিত্তিক উন্নত সমাজে মানবিক মূল্যবোধের এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিরাজমান ধারাবাহিক অবক্ষয়ের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। যদি আমরা এ সম্পর্কিত বড় প্রশ্ন এড়িয়েও যাই তবুও এটি সত্য যে, ইতিহাস ও সাম্প্রতিক উন্নয়নের দ্বারা আমাদের দেশের মতো দেশের স্বনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার যৌক্তিকতা প্রমাণিত। এটা বলা অতিরঞ্জিত হবে না যে, তাঁর 'নঈ তালিম' বা 'নয়া শিক্ষা'র তত্ত্ব ও বাস্তব প্রয়োগ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতের শিক্ষার পুনর্গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর শিক্ষাভাবনা একইসাথে ছিল মূল্যবোধ ভিত্তিক এবং গণমানুষ কেন্দ্রিক। এ ব্যবস্থা কর্মভিত্তিক শিক্ষার কথা বললেও এটির সর্বস্তরের কেন্দ্রে ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার গুরুত্ব। ভারতবর্ষে এটি ছিল প্রথম বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার মডেল।

ভারতের মতো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দেশের জন্য গান্ধীজির দর্শন প্রাসঙ্গিক। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের উপর চাপ না বাড়িয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে এটি কার্যকর। এটি অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনমুখী। কারণ এটির ভিত্তি কাজের নীতি। বুনিয়াদি শিক্ষার কেন্দ্রিয় স্থান অধিকার করে রয়েছে এই কাজের নীতি। এ শিক্ষাব্যবস্থা উৎপাদনভিত্তিক এবং জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে তা সহায়ক। এ ব্যবস্থা শ্রেণি ও জাতিভেদ দূর করতে সম্ভব। এছাড়াও এ ব্যবস্থা শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, কায়িকশ্রম-বৌদ্ধিক শ্রম ইত্যাদির পার্থক্য দূর করে। এ শিক্ষাব্যবস্থা শিশুকেন্দ্রিক। সকল শিক্ষা কার্যক্রমের কেন্দ্রে শিশু বা উদ্দেশ্য শিশু। এটি সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারে। এটি সত্যিকার অর্থে একজন সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ মানুষের জন্য শিক্ষা। এর লক্ষ্য দেহ-মন ও আত্মার সমন্বিত বিকাশ।

কাজেই এটি অনেকটাই যুক্তিযুক্ত যে, বুনিয়াদি শিক্ষার গুরুত্ব এখনও বর্তমান এবং তা আধুনিক প্রেক্ষাপটের শিক্ষা সংস্কারে কার্যকর। গান্ধীজির নীতি আধুনিক শিক্ষার মূলনীতি হিসেবে বা চালক-নীতি হিসেবে প্রাসঙ্গিক। আসলে এটি আধুনিক প্রেক্ষাপট অনুসারে সংস্কার করা প্রয়োজন এবং তখনই তা শিক্ষার সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং ফলপ্রসূ কৌশলগুলির একটি হিসেবে কাজ করতে পারে। গান্ধীজি বুনিয়াদি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা পরিকল্পনায় নতুন এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেছেন। কিছু সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবায়নে পুরোপুরি সফল না হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর আর্থ-সামাজিক গুরুত্বের দিক অবহেলা করা যায় না।

তথ্যনির্দেশ

১. প্রদীপ্ত রঞ্জন রায়, *শিক্ষার দর্শন ও সমাজতত্ত্বগত ভিত্তি*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৬৫।

২. জাকির শামীম (অনু: ও সম্পা.), *মহাত্মা গান্ধী রচনাবলী: নির্বাচিত পত্রাবলী*, *খণ্ড:৪*, নালন্দা, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩০৫।

৩. Gandhi, M. K., *Towards New Education,* ed. By Bharatan Kumarappa, Bombay, p. 33.

৪. প্রদীপ্ত রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*।

৫. Avinashilingam, T. S., *Gandhiji's Experiment in Education,* Ministry of Education, Government of India, 1960, p. 56.

৬. Gandhi, M. K., *Collected Works,* Vol. xxi, Publication Divisions; Ministry of India, 1969, p. 38.

৭. *ঐ*, খণ্ড ২০, পৃ. ২২৫।

৮. Bose, Nirmal Kumar, *Studies in Gandhism,* Calcutta, 1962, p.203.

৯. Gandhi, M. K., *Educational Reconstruction,* Vora and Co., Publishers Limited, Bombay, 1938, p. 3.

১০. *ঐ*, পৃ. ২।

১১. জাকির শামীম (অনু: ও সম্পা.), *মহাত্মা গান্ধী রচনাবলী: নির্বাচিত পত্রাবলী*, *খণ্ড: ৫*, নালন্দা, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৪৭।

১২. প্রদীপ্ত রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*

১৩. শচীন চন্দ্র দাসগুপ্ত (অনু:), মহাত্মা গান্ধী, *গান্ধী রচনা সম্ভার*, *খণ্ড: ৩*, গান্ধী শতবার্ষিক সমিতি, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ২৩৬।

১৪. Bose, Nirmal Kumar, *Op. cit.,* pp. 39-41.

১৫. Bose, Nirmal kumar, *Ibid*, p. 41.

১৬. National Council of Education Research and Training (NCERT) ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা। স্কুল শিক্ষার গুণগত উন্নতির জন্য নীতি ও কর্মসূচির বিষয়ে কেন্দ্রিয় ও রাজ্য সরকারকে সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য সংস্থাটি গঠন করা হয়েছিল। এনসিইআরটি এবং এর ইউনিটগুলির প্রধান লক্ষ্য হলো: স্কুল শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলোতে গবেষণা পরিচালনা, প্রচার ও সমন্বয়; মডেল পাঠ্যপুস্তক, পরিপূরক উপাদান, নিউজলেটারস, জার্নাল, মাল্টিমিডিয়া

ডিজিটাল উপকরণ ইত্যাদি প্রস্তুতি ও প্রকাশ করা, শিক্ষকদের প্রাক-পরিষেবা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; উদ্ভাবনী শিক্ষামূলক কৌশল এবং অনুশীলনগুলি বিকাশ ও প্রসারণ; রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও এবং অনান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয়; স্কুল শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে ধারণা এবং তথ্যের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে কাজ করে। গবেষণা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ, প্রকাশনা এবং প্রচার কার্যক্রমের পাশাপাশি এনসিআরটি স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সাথে দ্বিপক্ষীয় সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের একটি বাস্তবায়ন সংস্থা।

১৭. ড. মিহির কুমার চ্যাটার্জী ও ড. কবিতা চক্রবর্তী, *শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতির রূপরেখা*, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৩৫২।

১৮. এটি রাশিয়ার অন্যতম বিখ্যাত লেখক লিও টলস্টয় (Leo Tolstoy) রচিত একটি দার্শনিক গ্রন্থ। গ্রন্থটি তাঁর নিজ দেশ, রাশিয়াতে, প্রথম নিষিদ্ধ হবার পর ১৮৯৪ সালে জার্মানিতে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি টলস্টয়ের ত্রিশ বছরের চিন্তার পরিণতি এবং সর্বজনীন প্রেমের খ্রিস্টধর্মের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সমাজের জন্য একটি নতুন সংগঠন তৈরির কথা বলে। এটি অহিংসা, অহিংসা প্রতিরোধ এবং খ্রিস্টান নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের টলস্টয়ের অনুসারীদের নিকট এটি মূল পাঠ্য।

১৯. Gandhi, M. K., *The Story Of My Experience With Truth,* Trans. By Mahadeve Desi, Penguin Books, London, 1927.

২০. ড. মিহির কুমার চ্যাটার্জী ও ড. কবিতা চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৫।

২১. Avinashilingam, T. S., *Op. cit.,* p. 81.

২২. Avinashilingam, T. S., *Ibid,* p. 67.

২৩. ড. মিহির কুমার চ্যাটার্জী ও ড. কবিতা চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৩।

২৪. জাকির শামীম (অনু: ও সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, *খণ্ড: ৫*, পৃ. ৩৪৬।

২৫. Prakash Bhausaheb Salavi, "Mahatma Gandhi on Education: Philosophical Perspective," *Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies (Vol.2, No. 9),* 2019, p1-8.

২৬. শচীন চন্দ্র দাসগুপ্ত (অনু:), মহাত্মা গান্ধী, *গান্ধী রচনা সম্ভার*, *খণ্ড: ৫*, গান্ধী শতবার্ষিক সমিতি, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ৩৭৫।

২৭. জাকির শামীম (অনু: ও সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, *খণ্ড: ৪*, পৃ. ৩০৪।

২৮. Gandhi M. K., *Collected Works, Op. cit.,* Vol. xx, p. 43.

২৯. Gandhi M. K., *Loc. cit.*

৩০. Gandhi M. K., *Loc. cit.*

৩১. Gandhi, M. K., *Op. cit.,* p. 22.

৩২. ড. মিহির কুমার চ্যাটার্জী ও ড. কবিতা চক্রবর্তী, *Op. cit.,* পৃ. ৩৫৬।

৩৩. প্রদীপ্ত রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭।

৩৪. ড. মিহির কুমার চ্যাটার্জী ও ড. কবিতা চক্রবর্তী, *Op. cit.,* পৃ. ৩৫৪।

৩৫. Avinashilingam, T. S., *Op. cit.,* p. 71.

৩৬. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, *শিক্ষা চিন্তা: রবীন্দ্রনাথের চিন্তা জগত*, গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৭৪।

৩৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "শিক্ষার মিলন" *শিক্ষা*, *২য় সংস্করণ*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৫০-১৭০।

৩৮. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।

৩৯. Acharya Poromesh, Is Macaulay still Our Guru, *Economic and Political Weekly,* 1988, p. 1126.

৪০. Acharya Poromesh, *Ibid,* p. 1126.

৪১. Gandhi, M. K., *Educational Reconstruction,* p. 74.

৪২. কে টি শাহ (১৮৮৮-১৯৫৩) ছিলেন একজন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ, এ্যাডভোকেট এবং সমাজতান্ত্রিক। ভারতের সংবিধান রচনায় গণপরিষদের কার্যকর ভূমিকা পালনকারী একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে তিনি অধিক পরিচিত। তিনি লন্ডন স্কুল অব ইকোনমি এবং গ্রে'স ইন-এর প্রাক্তন ছাত্র। তিনি ১৯১৪ সাল থেকে ভারতে আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

৪৩. Gandhi, M.K., *Educational Reconstruction, Op. cit.,* p. 74.

৪৪. Gandhi M. K., *Ibid* p. 79.

৪৫. Gandhi M. K., *Collected Works,* Vol. xiv, Publication Divisions; Ministry of India, 1969, p. 153.

৪৬. Gandhi M. K., *Loc. cit.*

৪৭. Gandhi M. K., *Loc. cit.*

৪৮. শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎ রচনাসমগ্র*, *খণ্ড: ৩*, মৌ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৬৯৫।

৪৯. শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *Op. cit.,* পৃ. ৬০৭।

৫০. ইভান ডমিনিক ইলিচ (১৯২৬-২০০২) একজন রোমান ক্যাথলিক যাজক, ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক এবং সামাজিক সমালোচক। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থটি আধুনিক সমাজের শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির সমালোচনা করে। তিনি বলেন, প্রচলিত পদ্ধতিতে সার্বজনীন

শিক্ষা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তিনি প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে একটি উন্নত ও বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।

৫১. Gandhi, M. K., *The Constructive Programme-Its Meaning and Place,* Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1981. p. 18.

৫২. Veerraju, Gummadi, *Gandian Philosophy—Its Relevance Today,* Decent Books New Delhi, India 1999, pp. 100-104.

৫৩. ম্যাকাওলান প্যারাডাইম (Macaulayn paradigm) বা ম্যাকাওলানবাদ (Macaulayism) শব্দটি ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ টমাস বেবিংটন ম্যাকোলে (Thomas Babington Macaulay; 1800-1859) এর নাম থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তিনি গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে দায়িত্ব পালন করেন এবং ভারতে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি নির্ধারণে ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে স্বাধীন ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদীগণ ভারতে ঔপনিবেশবাদের মন্দ প্রভাব এবং নিজেদের ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত নয় এমন একটি উপ-সংস্কৃতি তৈরির জন্য ম্যাকোলেকে দায়ী মনে করেন।

৫৪. Chakraborty, Rachana, "In Quest of Alternative Civilization: The Gandian Education Revisited" in Kumar Ravindra ed. *Education, Peace and Development* by Kalpaz Publications, India, 2012, pp.103-104.

৫৫. Kanasara, L., *Survey of Basic Education During the past Thirty Year and its Effect on Education in General and Society in particular,* Ph. D. Thesis, Bombay University, 1977, p. 256.

৫৬. Sykes, Marjorie, *The Story of Nai Talim: Fifty Years of Education at Sevagram,* Wardha, 1988, p. 51.

৫৭. *ঐ*, পৃ. ৫১।

৫৮. জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-১৯৬৬) কোঠারী কমিশন নামে পরিচিত। শিক্ষার একটি সাধারণ প্যাটার্ন উন্নয়নের জন্য, পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার সমস্ত দিক যাচাই করার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত একটি এ্যাডহক কমিশন ছিল এ কমিশন। ১৯৬৪ সালের ১৪ জুলাই ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান দৌলত সিং কোঠারীর সভাপতিত্বে এটি গঠিত হয়। কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সাধারন নীতি ও নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং ভারতে শিক্ষার মানসম্মত জাতীয় প্যাটার্নে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া। তবে, মেডিকেল এবং আইনী অধ্যয়নগুলিকে কমিশনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

৫৯. 'Socially Useful Productive Work (SUPW)' বা 'সামাজিকভাবে কার্যকর উৎপাদনশীল কর্ম'- ভারতীয় স্কুলগুলিতে প্রচলিত এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে শিক্ষার্থীরা বুনন, বাগান করা, রান্না করা, পেইন্টিং, কাঠের কাজ এবং অন্যান্য কারুশিল্প ও শখের মত বেশ কয়েকটি বিষয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বেছে নিতে পারে। এ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা একটি দল হিসেবে দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে কাজ করতে শেখে। গান্ধীবাদের মূল্যবোধ এবং মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাগত ধারণা প্রচারের জন্য তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে এটি চালু করেছিল।

৬০. Gandhi, M. K., *Educational Reconstruction, Op. cit.,* p. 27.

৬১. Gandhi M. K., *Collected Works, Op. cit.,* Vol. xx, p. 255.